ভূমিকা

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের আদিবাসী জনসংখ্যা প্রায় ১০.৪৩ কোটি এবং পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যা ৫২,৯৬,৯৬৩ জন, যা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৫.৮ শতাংশ এবং দেশের আদিবাসী জনসংখ্যার ৫.০৮ শতাংশ। ভারতে ৭০৫টি জনগোষ্ঠীকে "তপশিলি উপজাতি"র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যে ৪০টি জনজাতি এই পর্যায়ভুক্ত, তারা হল- ১। অসুর, ২। বৈগা, ৩। বেদিয়া, ৪। ভূমিজ, ৫। ভুটিয়া, শেরপা, টোটো, দুকপা, কাগাতে, তিব্বতি, য়োলমো, ৬। বিরহড়, ৭। বিরজিয়া, ৮। চাকমা, ৯। চেরো, ১০। চিক বারাইক (চিক বরৈক), ১১। গারো, ১২। গোণ্ড, ১৩। গোড়াইত (গরেত), ১৪। হাজং, ১৫। হো, ১৬। কারমালি (করমালি), ১৭। খারওয়ার (খেরোয়ার), ১৮। খোন্দ্ বা খোণ্ড, ১৯। কিসান, ২০। কোড়া, ২১। কোড়োয়া (কোরওয়া), ২২। লেপচা, ২৩। লোধা, খেড়িয়া, খাড়িয়া, ২৪। লোহারা, লোহরা, ২৫। মগ, ২৬। মাহালি, ২৭। মাহলি, ২৮। মাল পাহাড়িয়া, ২৯। মেচ, ৩০। মুু, ৩১। মুণ্ডা, ৩২। নাগেসিয়া, ৩৩। ওঁরাও, ৩৪। পাহাড়িয়া, ৩৫। রাভা, ৩৬। সাঁওতাল, ৩৭। সৌরিয়া পাহাড়িয়া বা শাওরিয়া পাহাড়িয়া, ৩৮। শবর, ৩৯। লিম্বু, ৪০। তামাং।[১] ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ৭৫টি গোষ্ঠীকে "Particularly Vulnerable Tribal Group" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের টোটো, বিরহড় ও লোধা সম্প্রদায় রয়েছে। বর্তমানে তপশিলভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের ৪০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২০১১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বৃহত্তম হচ্ছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী, জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ ১২ হাজার ৩৩১। কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীকে বাদ দিলে বেশিরভাগের সঙ্গে মূলস্রোতের সমাজ বা অনাদিবাসী সমাজ একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল– তা বলা যায় না; পুঁজিবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক ও সহাবস্থানের সমীকরণও দ্রুত পাল্টেছে। তবুও বাংলা কথাসাহিত্যে দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল আদিবাসী জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। বিশ শতকের প্রথম দিকে মূলত "কল্লোল"–"কালিকলম"

সময়পর্ব থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ মানুষের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনচর্চার সূত্রপাত। এই অন্ত্যজ জীবনচর্চার সূত্র ধরেই আদিবাসী জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় বাংলা সাহিত্যের পাঠকের। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ''মাসিক বসুমতী''র কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *কয়লাকুঠি* গল্পটি পাঠককে চমকে দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের আকাশে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। রানিগঞ্জ-অণ্ডাল কয়লাখনি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত এই গল্পে পাই সাঁওতাল, বাউড়ি কুলি-কামিনদের জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে এই ''নবত্ব''-এর সমালোচনা করলেও আশাপূর্ণা দেবী বলেছেন- ''অথচ এই শৈলজানন্দই একদা-বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন। একটি অজানিত প্রাচীরের অজানিত দরজার কপাট খুলে দিয়ে অন্য জগতের হাওয়া এনে দিয়েছিলেন।...বাংলা সাহিত্য-পাঠকের জানা ছিল না তার জানা জগতের বাইরে একটি বিশাল সমাজজীবন আছে। সেখানেও রয়েছে নরনারীর চিরন্তন হৃদয় রহস্য। রয়েছে সততা উদারতা প্রেম মহত্ব আনন্দ বেদনা। তথাকথিত 'সভ্যতার' আলো না পেলেও তাদের মধ্যেও রয়েছে একটি ন্যায়-অন্যায় বোধের বিচারে গড়া অকৃত্রিম সভ্যতা।''[২] শৈলজানন্দ-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ মনোনিবেশ করলেন অন্ত্যজ, উপেক্ষিত, প্রান্তিক মানুষদের বিচিত্র সামাজিক জীবনে, সেখানেই স্পন্দমান জীবনের উত্তাপের সন্ধান করলেন। সেই উপেক্ষিত, ব্রাত্য মানুষদের তালিকায় অন্যতম আদিবাসী সম্প্রদায়। এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় তাদের আনা-গোনা ছিল ঠিকই, কিন্তু নিজস্ব জীবন-সমাজ-সংস্কৃতিকে বুকে করে তারাই প্রধান হয়ে ওঠেনি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায় যারা এই ''অপজাত ও অপজ্ঞাত মনুষ্যত্বের''[৩] জনতা, তারাই বাংলা গল্প-উপন্যাসের মূল অবলম্বন হয়ে উঠবে- বাংলা কথাসাহিত্যে এই ধারার নির্মাণ বা প্রবণতার পেছনে শুধুমাত্র কল্লোলীয় রবীন্দ্রবিরোধিতাজনিত দ্রোহচেতনা ছিল না, ছিল সেইসময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক

ঘটনাপ্রবাহও। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ১৯২৪ সালে জন্ম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার। রুশ বিপ্লবের তিনবছরের মধ্যেই ১৯২০-তে তাসখন্দে ও ১৯২৫ সালে কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং বাংলায় মার্ক্স-লেনিন চর্চার সূত্রপাত, ১৯৩৬ সালে বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা "নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ", দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাত প্রভৃতি সেইসময়ের সাহিত্যচর্চাকে ও সৃষ্টিশীল মানসিকতাকে যে প্রভাবিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই দেশে ঔপনিবেশিক সময়কালের পূর্বে ছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো, ব্রিটিশ উপনিবেশকালে সামন্ততন্ত্রের জায়গা নিয়েছিল পুঁজিবাদী নব্যধনতন্ত্র। ব্রিটিশ উপনিবেশের আগে থেকেই ভারতীয় সমাজ নানা শ্রেণি ও জাতে বিভক্ত, ফলে শ্রেণিগত বৈষম্য ও শোষণ ছিলই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতি বদলালো মাত্র। পুঁজিবাদী ধনতন্ত্র শোষিত শ্রমিক শ্রেণির জন্ম দিল। বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই ভারতে মার্ক্সবাদের চর্চা এই শ্রেণিবৈষম্য সম্পর্কে শিক্ষিত মানসকে, সাহিত্যিক মানসকে সচেতন করেছিল। "কল্লোল", "কালিকলম", "গণবাণী" প্রভৃতি পত্রিকায় রুশ বিপ্লব বা মার্ক্সীয় শ্রেণিবিন্যাসসূত্রের প্রভাব পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৮ সাল থেকেই মার্ক্সবাদের চর্চা শুরু করেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অর্থে "কল্লোলে"র কেউ না হলেও তাঁর হাতেই বাংলা উপন্যাসে প্রান্তিক গোষ্ঠীজীবনের চর্চার প্রথম বিস্তৃত রূপায়ণ- "...এত দীর্ঘ, জটবাঁধা গ্রামজীবনের পথে আর কোনো বাঙালি সাহিত্যিক হাঁটেননি তাঁর মতো। বাংলার অন্ত্যজ হাড়ি ডোম মুচি বাগদি, বাঁশবাঁদির কাহার সম্প্রদায়, বনজ গন্ধ-মাখা বেদে- বাংলার সমতল মাটিতে বিছানো প্রান্তবাসী জনগুলির বর্ণাঢ্য জীবন তিনি অক্ষর ছবিতে রূপ দিয়েছেন।"[৪] পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা, তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি ভারতের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিবিভাজনকে স্পষ্ট করে এবং বাংলা উপন্যাসে নাগরিক জীবন, ব্যক্তিমানুষের জৈব প্রবৃত্তি, মানসিক সংকট, হতাশা

ও ক্লান্তির রূপায়ণের মূলধারার পাশাপাশি বাঙালি পাঠক পায় প্রান্তিক গোষ্ঠীজীবনের সন্ধান। সেই প্রান্তিক গোষ্ঠীজীবনের সূত্রেই বাংলা উপন্যাসে এযাবৎকালের উপেক্ষিত আদিবাসী জীবন, সমাজ, সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। এই উপেক্ষার স্বরূপ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়ক সত্যচরণের অনুভবে ও বয়ানে মূর্ত- "আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অপমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না।"[৫] বাংলা উপন্যাসে তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে শ্রেণিসচেতনতার সূত্রে আদিবাসী জীবন রূপায়ণের যে প্রচেষ্টার সূচনা, পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রমুখদের উপন্যাসে উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের অস্তিত্বের নির্মাণের ধারা বেয়ে তার ব্যাপ্তি। সত্তর দশকের রাজনৈতিক প্রভাবপুষ্ট কৃষক বিদ্রোহ স্বাধীন ভারতের প্রান্তিক মানুষের দুরবস্থার যে চিত্র তুলে আনে, সেই বাস্তবতাই সাহিত্যে তাদের অস্তিত্বকে স্থায়ী ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা *অগ্নিগর্ভ-র ভূমিকায়* মহাশ্বেতা দেবী আক্ষেপ করে বলেছিলেন- "বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল বিবেকহীন বাস্তব-বিমুখিতার সাধনা চলেছে। লেখকেরা দেওয়ালের লেখা দেখেও দেখছেন না। ফলে, সৎ পাঠকের মনে তাঁদেরও বিসর্জন ঘটেছে। বহু সমস্যা, বহু অবিচার, বহু জাতি, বহু লোকাচার সংবলিত দেশের লেখকরা লেখার উপাদান দেশ ও মানুষ থেকে পান না, এর চেয়ে বিস্ময়কর কী হতে পারে? মানুষের প্রতি এ ধরনের চূড়ান্ত উন্নাসিকতা সম্ভবত ভারতবর্ষের মতো আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, বৈদেশিক শোষণে অভ্যস্ত দেশের পক্ষেই সম্ভব।"[৬] এই অনুভবেই তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের একটা বিস্তৃতপর্ব জুড়ে আদিবাসীদের অনাবিষ্কৃত মহাদেশকে আবিষ্কারের সাধনায় নিবিষ্ট থেকেছেন। শোষিত মানুষের পক্ষে জীবনব্যাপী কথা বলার কারণস্বরূপ বলেছেন- "...নিজের মুখোমুখি হতে যেন লজ্জা না

পাই সে জন্য। কেননা লেখক জীবনকালেই শেষ বিচারে উপনীত হন এবং উত্তর দেবার দায় থেকে যায়।"[৭] অমিয়ভূষণ মজুমদার স্বীকার করে নিয়েছেন কোচবিহারের "temperate zone"-এর আরামই কোচবিহারের প্রতি তাঁর আসক্তি বাড়িয়ে তুলেছিল।[৮] কোচবিহারের প্রতি ভালোবাসার সূত্রেই প্রান্তিক জীবনের আখ্যান তাঁর উপন্যাসে। সেই সূত্রেই তাঁর কলমে আদিবাসী রাভাজীবনের বিশ্বস্ত নির্মাণ। ইতালির মার্ক্সবাদী দার্শনিক গ্রামশির *কারাগারের নোটবই*-তে প্রথম "সাব-অলটার্ন" শব্দের ব্যবহার ঘটে মার্ক্সীয় শ্রেণিবিন্যাসের সূত্রে, যার বাংলা পরিভাষা "নিম্নবর্গ"। এই নোটবই ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মুসোলিনির কারাগারে বন্দি অবস্থায় লেখা। প্রকাশিত হচ্ছে গ্রামশির মৃত্যুর পরে। গ্রামশির সাব-অলটার্ন ধারণাকে ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাস চর্চায় নিয়ে আসেন রণজিৎ গুহ, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, শাহিদ আমিন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী প্রমুখেরা। "সাব-অলটার্ন স্টাডিজ" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে এবং এর প্রথম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩-তে। অবশ্য তার আগে থেকেই বাংলা উপন্যাস নিম্নবর্গের বয়ান পেয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* বা অমিয়ভূষণ মজুমদারের *মহিষকুড়ার উপকথা*। তা সত্ত্বেও বলা যায় বাংলা সাহিত্যকে, উপন্যাসকে নিম্নবর্গের এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সময়ের অভিঘাতে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তিক সম্পর্কের বহুস্তরীয় বিন্যাসে সাহিত্যভাবনায় প্রান্তিক বাস্তবতার নির্মাণ ঘটে মহাশ্বেতা দেবী, অমিয়ভূষণ মজুমদারের মতো রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, নারায়ণ সান্যাল, প্রফুল্ল রায়, দেবেশ রায় প্রমুখদের হাতেও। উপন্যাসের উপাদান তাঁরা খুঁজলেন দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে। উচ্চবর্গের ইতিহাসের তলায়, সমাজ-রাজনীতির তলায় চাপা পড়া এদেশের দীর্ঘদিনের বঞ্চিত ও অবহেলিত প্রাচীন জনজাতির নিজস্ব মিথ-লোককথা-বিশ্বাসের সন্ধান করলেন। এই দেশ-জাতি-সংস্কৃতির বাস্তবতার নির্মাণে বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের একটি অনন্ত সম্ভাবনাময় সমান্তরাল ধারাকে

সাম্প্রতিকসময়েও সমৃদ্ধ করেছেন ও করে চলেছেন বুদ্ধদেব গুহ, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘড়াই (২০১৪ সাল পর্যন্ত) প্রমুখেরা।

দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত আদিবাসীদের অনালোকিত জীবনকে বাংলা উপন্যাসের আলোকের বৃত্তে উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিকেরা যে প্রান্তিক বাস্তবতাকে উন্মোচিত করেছেন, সেই সূত্র ধরেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের নানা পর্যায় ও সংগ্রামের বহুস্তরকে সন্ধান করেছি "স্বাধীনতা- উত্তর বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন – সমাজ - সংস্কৃতি (১৯৪৭-২০০০)" শিরোনামের এই গবেষণা-সন্দর্ভে। আলোচনা ও বিশ্লেষণে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণা-কর্মটিকে ছ'টি অধ্যায়ে ভাগ করেছি এবং অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মধ্যে দিয়েই আমরা গবেষণার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছি।

প্রথম অধ্যায় - ভারতের আদিবাসী : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

মূলপর্বের গবেষণায় প্রবেশের পূর্বে প্রথমেই ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের দিক দিয়ে ভারতের আদিবাসীদের পরিচয় জানার প্রচেষ্টা আছে এই প্রথম অধ্যায়ে। এখানে ভারতের "আদিবাসী", "ট্রাইব" বা "উপজাতি" প্রভৃতি ধারণার নির্মাণ, নির্মাণের সময়পর্ব, অতীতের সময়পর্বে এদের অস্তিত্বকে খোঁজার চেষ্টা যেমন আছে, তেমনই আছে অবয়বগত লক্ষণ ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে স্বরূপসন্ধান। ব্রিটিশ উপনিবেশ সময়ে আদিবাসী চিহ্নিতকরণ, তাদের জীবনকে প্রভাবিত করা আইন থেকে স্বাধীন ভারতে আদিবাসী কল্যাণমুখী আইন ও ব্যবস্থার পরিচয়ের সূত্র ধরে ভারতের আদিবাসী, তাদের অবস্থা ও অবস্থানের অনুসন্ধান আছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বাংলা সাহিত্য : আদিবাসী প্রসঙ্গ

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায় আসলে বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী প্রান্তিক জীবনের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণের পূর্বের বাংলা সাহিত্যে এই কেন্দ্রিক প্রবণতা ও প্রেক্ষাপটকে বোঝার চেষ্টা। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বাংলা কাব্য-কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও কথাসাহিত্যে আদিবাসী সমাজজীবনের উপস্থিতির সন্ধান আছে এই অধ্যায়ে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ে বিভিন্ন সাহিত্যধারায় আদিবাসীদের নামমাত্র উপস্থিতি থেকে উপন্যাসের সমগ্র শরীরজুড়ে তাদের সমাজ-সংস্কৃতিসহ জোরালো অস্তিত্বের পথে যাত্রার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপটকেও খোঁজা হয়েছে এখানে।

তৃতীয় অধ্যায় - স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস : আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

বাংলা উপন্যাসের আদিবাসী জীবনের প্রতিষ্ঠা ও রূপায়ণের বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণের অনুসন্ধানের প্রয়াস আছে এই গবেষণাপত্রের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে। গবেষণার মূলপর্বের আলোচনার প্রথমেই এই তৃতীয় অধ্যায়ে ঔপন্যাসিকের কলমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাহিত্যিক নির্মাণকে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রয়াস আছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান কীভাবে একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় ও বিশেষত্বকে নির্মাণ করছে, তারই বিশ্লেষণ থাকছে এখানে। মানব-মানবীর সম্পর্ক ও প্রেম-ভালোবাসা-জিঘাংসা অতিরিক্ত মিথ-অন্ধবিশ্বাস-দেবতা-পূজা-বিবাহ-ডাইনি প্রথা প্রভৃতিতে ঘেরা কৌম সমাজজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনুসন্ধান করা হয়েছে অন্তর্বিদ্যামূলক আলোচনার সাহায্যে।

চতুর্থ অধ্যায় - স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস : আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থ-জীবন – অভিঘাত ও পালাবদল

আদিবাসী জীবনকে জানার বৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে ও সেই আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ওপর আসা অভিঘাতকে জানা ভিন্ন। তাই আদিবাসী জীবন রূপায়ণও অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাদের আর্থিক অবস্থাকে না দেখালে। এই অধ্যায়ে বাংলা উপন্যাসের পরিসরে আদিবাসী জীবনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অভিঘাত ও পালাবদলের সন্ধান করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় - স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে আদিবাসী সমাজ

আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সূত্র ধরেই এসে পড়ে তাদের আন্দোলনের প্রসঙ্গ। ইতিহাস কখনও কখনও আদিবাসী জীবনের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকা আর্থিক শোষণ ও নির্যাতনের খবর শোনায়। ব্রিটিশ শাসনকালে এই শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তি, বেঠবেকারি থেকে মুক্তি এবং জমি-জঙ্গলের পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে তাদের আন্দোলনের সাহিত্যিক নির্মাণের বাস্তবতাকে ইতিহাসের আলোর তলায় রেখে দেখার প্রয়াস আছে এখানে। শুধু, ব্রিটিশশাসিত ভারতেই নয়, স্বাধীন ভারতেও তাদের ওপর ঘটা আর্থ-সামাজিক শোষণ ও বৈষম্য থেকে যায় বলেই, উন্নয়নের নামে জমি লুঠ হয় বলেই বিচ্ছিন্ন আন্দোলন গড়ে ওঠে, স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি ওঠে, জাতিসত্তার ভিত্তিতে রাজ্য গঠিত হয়। ঔপন্যাসিকের কলম এর পেছনের যে আর্থিক বৈষম্য ও শোষণকে চিহ্নিত করেছে, তাকে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা আছে এখানে।

ষষ্ঠ অধ্যায় - উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও আদিবাসী জীবন

উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আধিপত্য ও অধীনতার ধারণা মূলত অর্থনৈতিক, সামাজিক। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতার অধিকারী উচ্চবর্গ ও ক্ষমতাহীন নিম্নবর্গ।

আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের একটা অংশ। ব্রিটিশ শাসনের আগে, ব্রিটিশ শাসনকালে ও স্বাধীন ভারতে নানা সূত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি উচ্চবর্গের শোষণ, ঘৃণা, বৈষম্য বা উদাসীনতার যে সাক্ষ্য সমাজদেহে ছিল, মন, মানসিকতা এবং আচরণে ছিল বা আছে- বাংলা উপন্যাসে সেই বাস্তবতার নির্মাণকে সন্ধানের প্রয়াস আছে এই অধ্যায়ে।

"উপসংহার" অংশে গবেষণা-সন্দর্ভের সামগ্রিকতাকে তুলে ধরে আদিবাসী গোষ্ঠীজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনার যে ধারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্ফিত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের গবেষণাকাজের যে অবকাশ থাকছে - সেই দিকে প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের এইজাতীয় গবেষণা কাজে এই গবেষণা-সন্দর্ভ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে বলে আশা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। Government of West Bengal, Tribal Development Department, *List of Scheduled Tribe of West Bengal,* http://www.adibasikalyan.gov.in, Accessed on-24/3/2020

২। আশাপূর্ণা দেবী, "নিজের আয়নায়", *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা,* শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ১০

৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ,* ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃষ্ঠা- ৮৩

৪। হাসান আজিজুল হক, "তারাশঙ্কর : জীবনের গাঢ় সমাচার", *তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য,* প্রদুম্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃষ্ঠা- ৮৮

৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আরণ্যক,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, চতুর্বিংশ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৬, পৃষ্ঠা- ১০৭

৬। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকা", "অগ্নিগর্ভ", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র অষ্টম খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৩২৪-৩২৫

৭। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকা", "অগ্নিগর্ভ", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র অষ্টম খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৩২৫

৮। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "নিজের কথা", *কবিতীর্থ* পত্রিকা, জন্মশতবর্ষে অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, মাঘ ১৪২৪, পৃষ্ঠা- ২২৮